আফজল গুরুর ফাঁসি নিয়ে কিছু বিচার-বিবেচনা

বলবেন নির্মালাংশু মুখার্জী

২ নভেম্বর শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায়
২৩ নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ১২
(প্রয়াত ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দের বাড়িতে)
যোগাযোগ : মন্থন সাময়িকী (০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬)

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন

Vol 5 Issue 10 16 November 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

পঞ্চম বর্ষ দশম সংখ্যা ১৬ নভেম্বর ২০১৩ শনিবার ২ টাকা

• আধার কার্ড পৃ ২ • ছট পূজা পৃ ২ • কেদারনাথ ঘুরে পৃ ২ • বিচারব্যবস্থা পৃ ৩ • নাবালিকার বিয়ে পৃ ৩ • পাথরা পৃ ৪ • টাইফুন পৃ ৪ • ফুকুশিমা পৃ ৪

আলু নিয়ে কি রাজ্যে ফাটকা চলছে?

মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন, জানবাজার, ১৫ নভেম্বর •

রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলি, প্রাদেশিক কৃষক সভা প্রভৃতি জানিয়ে দিয়েছে, আলু নিয়ে ফাটকা চলছে রাজ্যে, সরকারের মদতেই। আলুর সংকট কিছু নেই। সরকার যখন আলুর দাম বেঁধে দিল, তখন আলুর দর ছিল আট টাকা। সেই বেঁধে দেওয়া আলুর দরে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছিল। আলুর দাম চড়িয়ে রাতারাতি সরকার আলুর দাম বেঁধে দিল তেরো টাকা। রাজ্যের তৈরি করা এই সংকটে আলুচাষি খুচরো আলু বিক্রেতা বা সাধারণ ক্রেতা কেউ উপকৃত নয়, বরং আক্রান্ত। কৃত্রিম আলু সংকটে লাভ হচ্ছে ফাটকাবাজদের। পকেট ভরতি হচ্ছে শাসক দলের নেতা মন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনের এক অংশের।

এই সপ্তাহে ধর্মতলার কাছেই জানবাজারে চল্লিশটাকা দরেও আলু বিক্রি হয়েছে। পনেরোই নভেম্বর আলু বিক্রি হয়েছে জানবাজারে ২০ টাকা কেজি। কেসটা কী জানতে সিঙ্গুরের বড়ো চাষি মহাদেব দাসের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, আলু ওঠার সময় চাষি আলু সাড়ে চার টাকা দরে বেচতে বাধ্য হয়েছিল। আলু উৎপাদন খরচই পড়ে যায় সাড়ে ছটাকা। বর্তমান আলু স্বাভাবিক দামেই খুচরো বিক্রি হচ্ছে। ফাটকা নয়। আলু স্টোরে যা আছে, তাতে টান পড়বে। অতিবৃষ্টির জন্য আলু চাষে প্রায় একমাস দেরি হয়ে গেল। বাজারে নতুন আলু আসতে দেরি হবে। তবে আপনাদের জানবাজারে জ্যোতি আলু ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলছে, এটি ফাটকাই বটে। এখানে (সিঙ্গুরে) সরকারি দরে আলু বিক্রি হয় না। রেশনে আলু দেওয়ার কথা শুনেছিলাম। কিন্তু এখনও তা আসেনি। এখানে খুচরো আলু পনেরো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে আলু নিয়ে তেমন ফাটকা হয়নি। সেখানে খোলাবাজারে আলু পনেরো টাকা দরেই বিক্রি হচ্ছে।

এবছর আলুর উৎপাদন উদ্বৃত্ত হারেই হয়েছিল। নব্বই লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়েছিল, যেখানে রাজ্যে চাহিদা ষাট লক্ষ টন। সবার আগে প্রশ্ন উঠছে, জোগানের চেয়ে চাহিদা বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। অথচ উৎপাদন বেশি হওয়ার পরও বাড়াটা কি ফাটকা নয়?

জাতীয় ব্যাঙ্কে মাসিক সঞ্চয় প্রকল্পে ন্যূনতম জমা দুশো টাকা থেকে বেড়ে হল পাঁচশো টাকা!

মঞ্জু চক্রবর্তী, হালতু, ১৩ নভেম্বর •

এখন থেকে সাধারণ স্বল্প উপার্জনকারীরা আর জাতীয় ব্যাঙ্কে মাসিক সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা জমাতে পারবে না। দিন কয়েক আগে আমি ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের ঢাকুরিয়া শাখায় প্রত্যেক বছরের মতো এবার আগের বছরের মাসিক সঞ্চয়ের জমা তোলার সময়, পরের বছরের জন্য ২০০ টাকা করে জমার কথা বলি, তখন আমাকে পরিচিত কাউন্টারের দিদি জানান এখন থেকে ৫০০ টাকার কমে মাসিক সঞ্চয় করা যাবে না। আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করি এবং অবাকও হই।

এর পরে আমি আমার পরিচিত ব্যাঙ্কের মল্লিকবাবুর কাছে বিষয়টি জানতে চাই। তিনিও বলেন, হ্যাঁ এখন এটাই নিয়ম হয়েছে, এটাই রাখতে হবে। এবং সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে মাসে মাসে কাটিয়ে নিতে হয়, তাহলে ৫১ টাকা বেশি জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্কের এই অদ্ভুত নিয়মে আমার মতো স্বল্প উপার্জনকারীর পক্ষে আর হয়তো মাসিক সঞ্চয় করা সম্ভব হবে না।

আমার মনে পড়ে গেল, এই ব্যাঙ্কেই আমি ৫ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে প্রথম সেভিংস অ্যাকাউন্ট করি। এর কিছু দিন পর থেকে আমি ১৫টাকা করে মাসিক সঞ্চয়ের প্রকল্প করি। এর পর থেকে একটু একটু করে আমি এই মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে থাকি। মাঝে কিছু বছর আমি ১০০, ২০০ এমনকী ৩০০ টাকা করেও মাসিক সঞ্চয়ে জমা করি, কোনোটা এক বছর কোনোটা দুই বছর, কোনোটা ৩ বছরের জন্য। বছর দুয়েক আগে আমার পরিবারের মূল উপার্জনকারী গত হওয়ায় আমার মাসিক সঞ্চয়ের টাকা রাখার পরিমাণ কমে আসে। এখন থেকে আমি হয়তো আর মাসিক সঞ্চয়ে টাকা রাখতে পারব না।

টিভিতে দেখি খবরের কাগজে পড়ি যে সাধারণ মানুষের জন্য সরকার কত কিছু করছে। সরকারের সব কাজই বড়োলোকদের জন্য। এখন আবার গ্যাসের ভরতুকির জন্য ব্যাঙ্কের শংসাপত্র লাগবে। লাগবে আধার কার্ডও। সে তো আসলে কী বুঝেই উঠতে পারলাম না। এত কার্ড রাখাও মুশকিল। সাধারণের পক্ষে এখন দিন চালানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

লবণ উধাওয়ের গুজবে নুন মজুত করার হিড়িক দেখল উত্তরবঙ্গ

সোমনাথ চৌধুরি, কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর •

গতকাল ১৪ নভেম্বর রাতে ৯টা নাগাদ আমার এক বন্ধু ফোন করে লবণের দাম জানতে চাইল, তা আমি আমার জানা দামটা জানাতে সে হেসে বলল যে এখন আর ওই দাম নেই। কেজি ২০০—২৫০ টাকা চলছে। আমি ভাবলাম রসিকতা। পরে ফেসবুকে দেখি কোচবিহারের কিছু পেজ বা ব্যক্তিগতভাবেও লবণের দাম নিয়ে আপডেট বা আলোচনা চলছে। মনে হয়েছিল কোথাও কোনো একটা গণ্ডগোল চলছে।

সকালে কাজের মাসি আসার পর তার কাছে জানলাম, লবণ নিয়ে মারামারি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে কোচবিহারের টাকাগাছ অঞ্চলে। সেখানে এক দোকানে একটা বাচ্চা ছেলেকে তার বাড়ি থেকে জিনিসপত্র আনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন তার বাড়ির লোক। তা সেই জিনিসপত্রের মধ্যে লবণও ছিল। সেখানে দোকানদার এক কেজি লবণ ৩০০ টাকার কমে দিতে অস্বীকার করলে ছেলেটি চলে যায়। একটু পরেই তার বাড়ির লোক এসে হামলা চালায় দোকানে। সাথে আরও কিছু লোক ছিল। সেখানকার বাকি দোকানদার এবং কিছু স্থানীয় লোকের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে মারামারি লাগে। তবে কিছু প্রভাবশালী মানুষের মধ্যস্থতায় তা আর বেশি দূর গড়ায়নি।

এরপর আমি বাজারের দিকে যাই, দেখি জায়গায় জায়গায় লোকের ভিড়। তখনও আমার মাথায় লবণ-গুজব সংক্রান্ত ব্যাপারটা সেভাবে প্রভাব ফেলেনি। কিছুদিন হল সরকারি দামে আলু পেঁয়াজ বিক্রিতে এরকম লাইন দেখেছিলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম লবণ বিক্রি হচ্ছে। একটু আধটু না, বস্তায় বস্তায় লবণ বিক্রি হচ্ছে, তখন পর্যন্ত দাম ১৫০ টাকার আশেপাশে। একটু খেয়াল করে দেখলাম প্রায় সবার হাতে অন্তত এক প্যাকেট করে লবণ আছেই। কিন্তু লবণ কেন পাওয়া যাবে না, সেই কারণটা কেউই জানে না, শুধু জানে, আগামীকাল থেকে লবণ পাওয়া যাবে না। দেশে এমন কোনো ভৌগলিক পরিবর্তন হয়নি, লবণ কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে যায়নি, বা লবণ কেনার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। আর সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার, ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজ্যে, এমনকী দক্ষিণবঙ্গেও এই জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটেনি। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে লবণ শেষ হয়ে যাবে? ১৯৯৬ সালে গণেশের দুধ খাওয়ার গুজবের প্রভাব সারা দেশে ছড়িয়েছিল। মানুষের কাছে তখন যোগাযোগ ব্যাবস্থার সুযোগ খুবই সীমিত ছিল আর খবরের চ্যানেল তো ছিল না বললেই চলে। কিন্তু আজকের দিনেও যদি একই ঘটনা ঘটে যেতে থাকে তাহলে তো আর উন্নততর হয়ে চলার কোনো ফলাফল নেই।

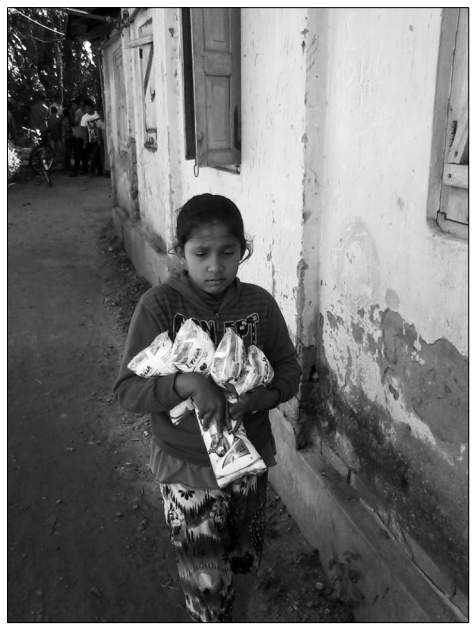

গোছা গোছা লবণের প্যাকেট কিনে ফিরছে কিশোরী, ছবি তুলেছেন অশেষ পাল, নকশালবাড়ি, ১৫ নভেম্বর

বাজার থেকে বাড়ি ফিরে আবার ফেসবুকে দেখলাম শিলিগুড়ি, ইসলামপুর, নক্সালবাড়ি থেকে মালদা পর্যন্ত এই গুজব ছড়িয়েছে। এবারে রাস্তা দিয়ে এই গুজব না ছড়ানো ও গুজনে কান না দেওয়ার আবেদন শোনা গেল মাইকে, সরকারের পক্ষ থেকে, তখন ১১টার কাছাকাছি ঘড়িতে। আবার বাজারে গেলাম, দেখলাম লবণ বিক্রি বন্ধ হয়নি। তবে ন্যায্য দামে পুলিশ প্রহরায় লবণ বিক্রি হচ্ছে সেইসব দোকানগুলো থেকেই। শুধু একটা ব্যাপারই অপরিবর্তনীয়, তা হল লবণ কেনার পরিমাণ।

আজকে বাজারে মাংসের (পোল্ট্রি মুরগি) দামকেও (১৫০ টাকা/কেজি) টেক্কা দিল লবণের দাম। ঝোলা হাতে বাজার থেকে ফেরার সময়ে একজন জিজ্ঞাসা করলেন — কত করে কেজি? আমি মুচকি হেসে চলে গেলাম। মনে পড়ছিল সেই গোপাল ভাঁড়ের ইলিশ মাছ কেনার গল্পটার কথা।

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের কল্যাণগড়ে শব্দবাজি ও কিছু সংলাপ

সওয়াল

দ্যাখ তো রাস্তার চারপাশ কেমন ধোঁয়ায় ভরে গেছে, আর এই ধোঁয়ার বিষ তোরা যেমন টানছিস, তেমনি আমরা সবাই তা শ্বাসের সঙ্গে টানতে বাধ্য হচ্ছি।

জবাব

কাকু আমরা তো এখন ইয়ং, এই সময় এগুলো ভালো লাগে।

কল্যাণগড়ের থেকে খুব বেশি দূর নয় সুকান্ত পল্লী, যেখানে এবারের কালীপূজোর রাতে শব্দবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেয়ে মরেছেন পিন্টু বিশ্বাস। কিন্তু তা বলে বাজি নিয়ে কথাবার্তা থেমে থাকেনি। সংলাপ সংকলন বঙ্কিম, ১২ নভেম্বর •

যান যান যা পারেন করুন, বায়োডাটা দিয়ে দিচ্ছি

লক্ষ্মীপূজার রাতে কল্যাণগড় এলাকায় বাজি ফাটানোর ধুম পড়ে। চারদিকে ধোঁয়াশায় ছেয়ে যায়। পূর্ণিমার চাঁদ ঢেকে ফেলে বিষাক্ত বাতাস। এক মুহূর্তের জন্যও শব্দের বিরাম নেই। লাগাতার বাজি ফাটতে থাকে। সন্ধ্যেবেলা রাস্তা দিয়ে সাইকেলে যাচ্ছি, আশপাশ থেকে মজা করে সাইকেলের সামনে বাজি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিছু ছেলে কয়েকটা বাড়ির দিকে টার্গেট করে শব্দবাজি ছুঁড়ছে। দুম দাম অসহ্য শব্দ। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। শান্তভাবে বললাম, দ্যাখো, তোমরা ওইদিকে বাজি ছুঁড়ছ কেন? বললাম, ওখানে একটা গর্ভবতী মেয়ে আছে, এই বিকট শব্দে মায়ের পেটের শিশুটিরও ক্ষতি হয়। চড়া স্বরে উত্তর, যান যান জ্ঞান দেবেন না, বলেই আমার পায়ের কাছে ওদের একজন বাজি ছুঁড়ে দিয়ে সরে গেল। তোমরা এমন করছ কেন! ফের ঝাঁজের সঙ্গে বলল, যা পারেন করুন, বায়োডাটা দিয়ে দিচ্ছি। ওদেরই দলের একটি ছেলে আমাকে বলল, ফালতু ঝামেলা করছেন কেন, চলে যান। বলে আমায় জোর করে টেনে সরিয়ে দিতে থাকল। বাকি ছেলেরা উল্লাসে বাজি ফাটাতে থাকল। আমি সাইকেলে উঠতেই পিছন থেকে বাজি ছুঁড়ে দিল। ঘরে ফিরে বন্ধুদের এসএমএস পাঠালাম, এমন কিছু শব্দ দিতে পারো যাতে কোনো শব্দ নেই ... স্তব্ধ আমি, শব্দে শব্দে ক্লান্ত ...

সংলাপে বঙ্কিম, কল্যানগড়

আমরা আর বাজি ফাটাব না ...

উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁকপুল-কল্যাণগড় অঞ্চলের একটি মোটামুটি জনবহুল রাস্তার পাশে আমার বাড়ি। বাড়ির কাছাকাছি একটা কালভার্টে এলাকা এবং আশেপাশের কিছু উঠতি বয়সের ছেলেছোকড়া সকাল বিকাল আড্ডা জমায়। সবাই মোটামুটি অভাবী পরিবারের ছেলে। কেউ কেউ নিয়মিতভাবে ছোটোখাটো হাতের কাজকর্ম করে। পূজা পার্বণে বিশেষত লক্ষ্মী ও কালীপূজায় বাজি পোড়ানো এদের একটা অভ্যাস। কয়েকবছর যাবৎই ভাবছি, ওদের বাজি না ফাটাতে বলব। কিন্তু ভরসা করে বলা হয়নি। — কাজ হবে কিনা ভেবে দ্বিধায় দ্বন্দ্বে পিছিয়ে এসেছি বারবার। এবারও কালীপূজার দু-দিন পর ৫ নভেম্বর সন্ধ্যের পর জনা দশবারো ছেলে বাজি পোড়াচ্ছিল। মুহুর্মুহু শব্দবাজিতে ঘরে টেঁকা দায় হল। অনেকক্ষণ দরজা জানলা বন্ধ রেখেও সহ্য করা যাচ্ছিল না। সেই দিনই দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার পাতায় শহরতলীর বাতাসে শব্দবাজিতে যে বিষ ছড়িয়ে গেছে তার খবর বেড়িয়েছিল। আবার কালীপূজাতেই অশোকনগরের নামটা বড়োবড়ো সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে এসেছে, কালীপুজোর রাতে বাড়ির সামনে এক পূজায় বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করেছিলেন অশোকনগর সুকান্ত পল্লীর পিন্টু বিশ্বাস নামে একজন। তার ফলে সেই রাতেই তাঁকে ছেলেপিলেরা 'মায়ের ভোগে' পাঠিয়ে দিয়েছে।

শেষমেশ এত কিছুর পরও শব্দের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাত ন-টা সাড়ে ন-টা নাগাদ সংবাদপত্রটি হাতে নিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, তোরা একটু বাজি ফাটানো বন্ধ কর। আশেপাশের অন্যরাও তাদের বাজি ফাটাতে নিষেধ করল। ওরা বাজি ফাটানো বন্ধ করে আমার দিকে মনোযোগ দিতেই খবরের কাগজের হেডিংটা ওদের পড়ে শুনিয়ে বললাম, — দ্যাখ তো রাস্তার চারপাশ কেমন ধোঁয়ায় ভরে গেছে, আর এই ধোঁয়ার বিষ তোরা যেমন টানছিস, তেমনি আমরা সবাই তা শ্বাসের সঙ্গে টানতে বাধ্য হচ্ছি। এই সময়ই হাসপাতালে কত লোক শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভরতি হয়, আবার অনেকে বাজি ফাটাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। দ্যাখ তোরা পয়সা খরচ করে যে বাজি ফাটাস, তাতে যে বিকট শব্দ হয়, এর কি কোনো সুর তাল আছে? মানুষ গান বাজনা ভালোবাসে কারণ তার সুর তাল ছন্দ আছে ... ওদের মধ্যে একজন বলল, কাকু আমরা তো এখন ইয়ং, এই সময় এগুলো ভালো লাগে। আর একটু কথা এগোতে ওরা আন্তরিকভাবে বারে বারে দুঃখ প্রকাশ করল, কাকু অন্যায় হয়ে গেছে, আমরা আর বাজি ফাটাব না কথা দিলাম। ওরা ওদের কথা রেখেছে, সেদিন তো নয়ই, এর পরে কদিনও ওরা আর বাজি ফাটায়নি। আমি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ রইলাম।

সংলাপে স্বপন গোস্বামী, কল্যাণগড়

এ আর কী দেখছেন, কলকাতা থেকে বস্তাবস্তা বাজি আনা হয়

কল্যাণগড়ে আমার বাড়ির কাছাকাছি এক বাড়িতে কালীপূজা হয়ে গেছে। দু-দিন বাদের সকালবেলা গিয়ে দেখি, সারা উঠোন বিভিন্ন ধরনের বাজির খোল, এবং পোড়া ছাইয়ে ছেয়ে আছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, এত বাজি পোড়ানো হয়েছে! ওই বাড়ির এক মহিলা গর্বভরে বললেন — এ আর কী দেখছেন, এবার তো মাত্র বারো হাজার টাকার বাজি এসেছে। অন্যান্যবার বিশ হাজার টাকার বাজি আসে, কলকাতা থেকে বস্তাবস্তা বাজি আনা হয়। এইবার বাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ের হাত পুড়ে দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তাই ... পাশের বাড়ির মহিলা বললেন, কালীপুজোর রাতে ঘরের দরজা জানলা কাঁপছিল, বাইরের বাথরুম পায়খানা ছাইয়ে ভরে গেছিল। ওই মহিলা কিন্তু গর্ভবতী।

সংলাপে বঙ্কিম, কল্যাণগড়

বাজি ফাটাচ্ছে ... শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে সে যে

এতদিনে পূজা কেটে গেছে। কিন্তু কল্যানগড়ে পূজার শেষ নেই। সেই দুর্গাপূজা থেকে শুরু হয়, জগদ্ধাত্রী পূজা শেষ হয়েও শেষ হয় না।

আমার হৃদরোগী বাবা (৭৬), পেসমেকার লাগানো, স্ট্রোকের পরও এবারের বাজির ধাক্কা সামলে নিয়েছেন। আর এক হৃদরোগী আমার মুমূর্ষু মামা (৬৭) দু-দুবার ওপেন হার্ট সার্জারির পরও টিকে আছেন। তিনদিনের জন্য এসেছেন, আমাদের বাড়ি বেড়াতে। আচমকা দিনে দুপুরে দুমদাম বাজি ফাটতে শুরু করল। ওঁরা চমকে উঠছেন। এ বয়সেও ওঁদের কানগুলো যায়নি। বেশ শুনতে পান। দ্রুত ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে বাইরে এসে দেখি, অবাক কাণ্ড, এ কী বিস্ময়! বাজি ফাটাচ্ছে এ কে? আমারই পাশের বাড়ির শান্ত-শিষ্ট, লক্ষ্মী মেয়ে সে যে।

সংলাপে বঙ্কিম, কল্যানগড়

সম্পাদকের কথা

আলু লবণ বাদে বাকিগুলো?

আলুর পর লবণ। আকাশছোঁয়া দামের নিরিখে শুধু এরা কেন, বাকি থাকবে না পেঁয়াজ থেকে কপি, বেগুন থেকে মিস্টিকুমড়ো। যে কোনও মাছ। চাল থেকে ডিম। প্রায় সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দাম, বেশি তো ছিলই, গত অক্টোবর মাস থেকেই বাড়তে বাড়তে এগুলো সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাজারে গিয়ে দেখতে পাই, সাধারণ বাজারে ক্রেতা কমছে, কেনা জিনিসের পরিমাণ কমছে।

বিক্রেতাও কমছে। বেশ কিছুদিন হলো দেখছি ঢাকুরিয়া বাজারে অনেকগুলো বিক্রেতার জায়গায় খালি পড়ে থাকছে। হয়ত রবিবার দিন, যেদিন প্রচুর ক্রেতা আসে, সেদিন সেগুলো ভর্তি হয়। একজন বয়স্কা সবজি বিক্রেতা 'লাল শাক' রাখতেন আগে। এখন রাখছেন না দেখে জিজ্ঞেস করলাম, বললেন, ও বাবা, পাইকারি তিনশ' টাকা পাল্লা! শুধু ক্রেতার অভাব নয়, ছোটো ছোটো খুচরো ব্যবসায়ীর পকেটেও টান পড়েছে এই অগ্নিমূল্যের বাজারে।

তবে আলু আর লবণের দাম বাড়ার কারণ ফাটকা। বাকিগুলোর জন্য নাকি ফাটকা দায়ী নয়, 'পরিস্থিতি' দায়ী। পরিস্থিতি মানে অতিবৃষ্টি থেকে ডিজেলের বর্ধিত দাম — সব কিছুই তার মধ্যে পড়ে। তাই আলু লবণে মিডিয়া, পার্টি, সরকার, প্রশাসন সক্রিয় হলেও বাকিগুলোতে নয়!

সংবাদসংলাপ

এক পুরোনো ব্যবসায়ী আলুর ছদ্মসংকট সৃষ্টির কথা বললেন

সংবাদমন্থনের ১ নভেম্বরের পঞ্চম বর্ষ অষ্টম-নবম সংখ্যায় 'শান্তিপুর পৌরসভার নাট্যোৎসব ...' প্রতিবেদনে নাটকের দল 'শান্তিপুর রঙ্গপীঠ' এর বানান বারবার ভুল করে রসপীঠ করা হয়েছে।

ওই সংখ্যাতেই 'আলুর দামও ...' সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহারের সোমনাথ জানিয়েছে, '২৮ অক্টোবর বাজারে গিয়েছিলাম, সাদা আলু – ২০ টাকা, লাল দেশি আলু – ২২ টাকা, ভুটান আলু – ৩২ টাকা, তার আগের সপ্তাহে এই দাম ছিল যথাক্রমে ১২ টাকা ১৪ টাকা আর ২২ টাকা। এখানকার বিক্রেতারা এই দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে জোগানের অপ্রতুলতার কথা বলছেন, আর এক পুরোনো ব্যবসায়ী ছদ্মসংকট সৃষ্টির কথাও বললেন, কিন্তু দাম বৃদ্ধির কোনো সন্তোষজনক কারণ এখনও খুঁজে পেলাম না।'

সংবাদমন্থনে প্রকাশিত যে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানান নিচের ঠিকানায় :
বঙ্কিম
কল্যাণগড়, অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা।
ফোন : 03216-238742,
ইমেল: manthansamayiki@gmail.com

অন্য পত্রিকার পাতা থেকে

ছট্ পূজা কী?

ভারতবর্ষের হিন্দিভাষী হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজা ছট্ পূজা। ছট্ অর্থাৎ ছটা বা রশ্মির পূজা। এই রশ্মি সূর্য থেকেই পৃথিবীর বুকে আসে। সুতরাং এই পূজা আসলে সূর্যদেবের পূজা। প্রত্যক্ষভাবে 'ছট্'-এর পূজা হলেও এই পূজার সঙ্গে জড়িত আছেন স্বয়ং সূর্যদেব, আছেন মা গঙ্গা এবং দেবী অন্নপূর্ণা। ...

পৌরাণিক কাহিনিতে রয়েছে — বর্ষার আগমন ঘটেছে, কিন্তু বৃষ্টি তেমন হয়নি। চাষিদের মাথায় হাত। মাঠের ফসল মাঠেই মারা যাচ্ছে। মা অন্নপূর্ণা ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকেন। সকল দেবতা মা অন্নপূর্ণার এহেন দুর্দশায় ব্যথিত। ঘরে ঘরে অন্নাভাব হাহাকার ওঠে। সূর্যের তাপ হ্রাস করে বাঁচার জন্য মা অন্নপূর্ণা সূর্যদেবের ধ্যান করতে শুরু করেন। তাতে হিতে বিপরীত হয়। সূর্যের প্রখর ছটায় মা অন্নপূর্ণা দিন দিন শ্রীভ্রষ্টা হয়ে ক্ষীয়মান হতে থাকেন। দেবলোকে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দেবতারা সম্মিলিতভাবে সূর্যদেবের কাছে গেলে তিনি মা অন্নপূর্ণার এই দশার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। এবং বলেন, মা অন্নপূর্ণা যেন গঙ্গাদেবীর আশ্রয় নেন। সূর্যদেব আরও বলেন, অস্তগমনকালে গঙ্গাদেবীর আশ্রয়ে থেকে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে এবং সপ্তমীর উদয়কালে মা অন্নপূর্ণা গঙ্গাদেবীর আশ্রয়ে থেকে উদীয়মান ছটা বা রশ্মিকে দেখে আমার স্তব বা ১২টি নাম উচ্চারণ করলে আমার স্মরণকারীকে সমস্ত বিঘ্ন থেকে মুক্তি দিই। সেইমতো মা অন্নপূর্ণা সূর্যের রশ্মি বা ছটাকে গঙ্গাদেবীর আশ্রয়ে স্মরণ বা ছট্‌ব্রত পালন করার পর সমস্ত পৃথিবী অন্নে পূর্ণ হতে থাকল। মা অন্নপূর্ণা আবার তাঁর শ্রী ফিরে পান।

তাই ছট্ পূজা বা ব্রত একাধারে সূর্যদেব, মা অন্নপূর্ণা ও গঙ্গাদেবীর পূজা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলা যায়, গঙ্গার জলে সেচ ব্যবস্থা ঠিক থাকলে অনাবৃষ্টিতেও খেত-খামার অন্নে পূর্ণ হয় এবং স্বাভাবিকভাবে মনুষ্যসমাজে খাওয়া-পরার অভাব থাকে না। এই ব্রত পালনে সূর্যদেবের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি আমাদের জীবনে যেমন বিঘ্ননাশক, দুঃখনাশক, তেমনি সুখদায়ক ও অর্থ-বৈভবদায়ক।

'বাংলার সমৃদ্ধ অঙ্গন' পত্রিকাটির সপ্তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যায় শৈলজানন্দ সামন্তের 'ছট্ পূজা' লেখাটির অংশ এখানে প্রকাশ করা হল। মুদিয়ালী, গার্ডেনরীচ থেকে হৃষীকেশ পালের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি প্রকাশ হয়ে চলেছে সাত বছর ধরে। দূরভাষ : ২৪৬৯-৬৩০১ এবং ৯৯০৩১৭১০০৮।

'পেট্রলের ভরতুকিও আধার কার্ডের সাথে জুড়ে দেওয়া হোক'

কুরণভিল্লা জন, দি হিন্দু-তে ১১ নভেম্বর প্রকাশিত ইংরেজি লেখার সম্পাদিত অনুবাদ চূর্ণী ভৌমিকের। লেখক ভারত রাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত আমলা •

মুদ্রাস্ফীতি, ফিসকাল ঘাটতি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি এবং টাকার দাম পড়ে যাওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন বিষয় নয়। এরা চক্রাবর্তের মতো একে অন্যের কারণ ও ফল। প্রত্যেকবার এইসব হলেই সরকার পেট্রোল ডিজেল গ্যাস কেরোসিন জ্বালানির দাম বাড়িয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ঢেঁকির মতোই একটা দিক স্থির হলেই অন্য প্রান্ত অস্থির হয়ে ওঠে। জ্বালানির দাম বাড়লে বাড়ে পরিবহণ খরচা ফলে সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং সরকারি খরচাও হয় বেশি– বেড়ে যায় মহার্ঘভাতা, বাড়ে যাতায়াত থেকে কেনাকাটা, ভাড়া নেওয়ার খরচ (ছাপিয়ে যায় জ্বালানির দাম বাড়ানোর ফলে হওয়া সাশ্রয়কে) — অতএব ফের ফিসকাল ঘাটতি। হাত পাততে হয় বাইরে, যেতে হয় এফআইআই, এফডিআইও-দের দরজায়, যার পরিষেবার মূল্য চোকাতে গিয়ে ফের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঘাটতি, অতএব ফিরে এলাম যে-কে-সেই আগের দশায়। আসলে কল্পনাশক্তির অভাব এবং ব্যক্তিগত পরিবহনের পরিবর্তে জনপরিবহনের পক্ষে প্রচারের মাধ্যমে সামগ্রিক জ্বালানি খরচের হার কমানোর প্রতি অনীহা।

আমাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য পেট্রলের কম ব্যবহার করানোর প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায় বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গোলমেলে বিষয়ের চাপে। রান্নার গ্যাসের ভরতুকির টাকার সরাসরি হাতে দেওয়ার যে ব্যবস্থা মোটের উপর সফল ভাবে চালু হয়েছে, সেই একই ব্যবস্থার সাহায্যে এই পেট্রোল ডিজেলের ব্যাপারটাকে হাত ফসকে যাওয়া থেকে বাঁচানো যেতে পারে :

ক। প্রতি মাসে/ সপ্তাহে/ পক্ষে পেট্রল/ডিজেল/গ্যাসের আসল দাম পরিষ্কার ভাবে ঠিক করা হোক, ভারত সরকারের নির্দিষ্ট স্থায়ী কোনো বিচারবিভাগীয় পেট্রলিয়াম কমিশনের সাহায্যে।

খ। ৯টা গ্যাস সিলিন্ডারের মতোই ভরতুকিভুক্ত করে বরাদ্দ করা হোক পরিবার পিছু জ্বালানির নির্দিষ্ট পরিমাণ, তা সেই পরিবারের যতগুলো মোটরগাড়ি থাকুক (ধরা যাক ৬০০ লিটার পেট্রোল বা ডিজেল প্রতি বছর)

গ। রান্নার গ্যাসের মতোই মোটরগাড়ির মালিক পেট্রল পাম্পে পুরো দাম মেটাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার আধার কার্ডে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকির টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

ঘ। এই বরাদ্দ পরিমাণের থেকে বেশি তেল কেউ কিনতেই পারে, কিন্তু তার জন্য ভরতুকি পাবে না, যেমন গ্যাসের ক্ষেত্রে নিয়ম করা হয়েছে।

পরে এই ভরতুকিতে আরও সূক্ষ্ম বিভাজন আনা যেতে পারে, যেমন তেল-সাশ্রয়কারী ছোটো গাড়ির জন্য একরকম ভরতুকি আর তেল-খেকো লিমুজিনের জন্য আরেকরকম।

গাড়িবারান্দায় রাখা আমাদের পুরোনো ধুলো পড়া সাইকেলটা যাতে রাস্তায় চালানো যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেটাকে ঝেড়েঝুড়ে ন্যাতানো টায়ারে হাওয়া ভরে তেল মাখানো হল। দারুণ! দিব্যি চলে — জ্বালানি ছাড়াই। এক আশ্চর্য অভিযানের আশায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে ধীরেধীরে প্রাগৈতিহাসিক সাইকেলও বেরিয়ে এল আমাদের কলোনির গলি থেকে ব্যস্ত রাস্তায়। কৌতুকভরে মোটরবাইকওয়ালারা এই টলোমলো 'বিলুপ্ত প্রজাতি'র যানটির পাশ কাটিয়ে গেল একটু দূরত্ব বজায় রেখে, আর ঝকঝকে লিমুজিন গাড়িগুলো সাঁইসাঁই করে বেরিয়ে গেল তাদের এই হতদরিদ্র রাজস্বের বালাইহীন কুটুমটির দিকে দৃক্‌পাত না করে।

মৃতপ্রায় টাকার অবস্থা ফেরানোর শ্রেষ্ঠ দাওয়াই — প্রতিবার জ্বালানির দাম বাড়ার সাথে সাথে আসুন আমরা চালু করি স্বপ্নের সাইকেল লেনগুলো, হারিয়ে যেতে বসা ফুটপাথ, লুপ্তপ্রায় প্রজাতির ক্রসিং, আর ঘষেমেজে ফেলি আমাদের সড়ক পরিবহণ নিগমগুলোকে।

মৃত্যু উপত্যকা কেদারনাথের পথে (পর্ব দুই)

সাজিশ জি পি, কেরালা, ২৭ অক্টোবর। লেখক জুন ২০১৩ বিপর্যয়ের আগে ৬ বার গেছেন কেদারনাথ, ট্রেকার পর্যটক হিসেবে। বিপর্যয়ের পর ১৩ অক্টোবর তিনি ফের যান কেদারনাথ। ফিরে এসে ২৭ অক্টোবর তাঁর ব্লগে (http://indiegenous.blogspot.in/2013/10-/context-picturesque-uttarakhand-state.-html) ইংরেজিতে লেখেন এইবারের যাত্রার সচিত্র বর্ণনা, 'ব্যাক টু কেদারনাথ, এ ভ্যালি অব ডেথ'। এখানে তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে, লেখকের অনুমতিক্রমে। অনুবাদক শমীক সরকার। •

গৌরীকুণ্ড পৌঁছে দেখলাম, অর্ধেক শহরটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। গরম জলের ফোয়ারাটা নেই। মন্দিরগুলো নেই। পড়ে আছে কিছু পরিত্যক্ত দোকানপাট। এই গৌরীকুণ্ডে হাজার হাজার মানুষ চলে ফিরে বেড়াত। রাস্তায় জায়গা পাওয়া দায় হত। ভক্তিমূলক গানে ম ম করত জায়গাটা। দোকানে দোকানে বিক্রি হত 'চারধাম ডিভিডি', শীতের পোশাক, খাদ্য, পান, অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং আরও কত কী। এখন কানে তালা ধরা নৈঃশব্দ। আরেক অর্থনৈতিক দুঃস্বপ্ন। কয়েকটা খচ্চর শুধু প্রস্তুতি নিচ্ছে ওপরে যাওয়ার জন্য। বেলা দুটোয় আমরা গৌরীকুণ্ড পৌঁছালাম। দু-ঘন্টায় পাঁচ কিমি চড়াই, খারাপ নয়। আমরা আজ পৌঁছাব ভীমবালি। আরও ৭ কিমি দূর। আগে লোকে গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথের জন্য হাঁটতে শুরু করে থামতে হত রামবড়াতে। এখন রামবড়া নয়, থামতে হচ্ছে ভীমবালিতে। রামবড়াতে কিছু ডুলির ধ্বংসাবশেষও দেখা গেল। কেদারনাথ যাওয়ার জন্য কেউ হাঁটত, কেউ ঘোড়ায় চাপত। কেউ আবার যেত এই পালকিতে। চারজন বয়ে নিয়ে যেত একজনকে।

গৌরীকুণ্ডে একটুখানি চা বিস্কুট খেয়ে নিয়ে পরের ধাপের জন্য রওনা দিলাম। দূরে দেখা যাচ্ছে কেদারনাথের পুরোনো ট্রেক রুট। রাস্তায় ইতিউতি পড়ে থাকতে দেখা গেল, খোলা প্রণামী বাক্স, পুজোর উপাচারের লাল থানকাপড়ের অংশ। আর পুরোনো রাস্তার আশেপাশে আগে যে ধাবাগুলো ছিল, যেখানে ট্রেকাররা খাওয়া দাওয়া করত, তার ধ্বংসাবশেষও নজরে এল। দূরে একটা ঢালু পাথরের মাঝখানে নজরে এল একটা আটকে পড়া জ্যান্ত ভেড়া। কীভাবে ওখানে চলে গেছে! নিশ্চয়ই বাসা খুঁজে পাবে। এক কিলোমিটার যাওয়ার পরে আমাদের পুরোনো ট্রেক রুটটা ছাড়তে হল। কারণ ওটার আর অস্তিত্ব নেই। বেশ কিছুটা চড়াই ভেঙে নয়া ট্রেক রুটে পৌঁছাতে আমাদের বেশ কষ্টই হচ্ছিল।

রাস্তায় আমরা দেখলাম, উদ্ধারকারীদের একটি হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ। এখানে ভেঙে পড়েছিল কপ্টারটা। কপালজোরে খাদের মধ্যে না পড়ে রাস্তার ওপর পড়েছিল বলে সওয়ারীরা বেঁচে যায়। পাহাড়ে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়ে যায়, সন্ধ্যে নেমে আসছিল। চারদিকে যেদিকেই চোখ যায়, ভূমিধসের চিহ্ন সর্বত্র। তবে গত কয়েক মাসে, অথবা কয়েক লক্ষ বছরে যা বদলায়নি, তা হল হিমালয়ের সৌন্দর্য। আমার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছিল, কেন এসেছি আমি, হিমালয়ের সৌন্দর্যের টানে, নাকি কেদারনাথে কী হয়েছিল তা খুঁজে পাওয়ার টানে। দুটোই। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যে ছ-টার সময় আমরা পৌঁছালাম ভীমবালি ক্যাম্পে। এখান থেকে একটা নধর ভুটিয়া কুকুর আমাদের সঙ্গী হয়েছিল।

এই ভীমবালি ক্যাম্পের যেখানে আমরা ছিলাম, সেটার মালিক গুপ্তকাশির লোক। এই তল্লাটের বেশ কয়েকটি হোটেল আর দোকানের মালিক ছিল সে। এখন সে কেবল এই ক্যাম্পটি চালায়, তার আর খুব একটা কিছু পড়ে নেই। আমি তাকে চিনতে পারলাম, আজই সকালে গুপ্তকাশিতে তার ওষুধের দোকান থেকে কয়েকটা পেনকিলার কিনেছিলাম। ভীমবালিতে একটা হেলিপ্যাডও নজরে এল।

ভীমবালিতে আমরা মোট তিরিশ জন মতো ছিলাম সেই রাতে। একজনের সঙ্গে পরিচয় হল, স্বামী সুশান্ত। আমাদের সঙ্গেই এসেছে গুপ্তকাশী থেকে। ১৭ জুনের সকালে যখন কেদারের ওপর ৭০ ফিটের জল-পাথরের পাহাড় নেমে এসেছিল, সে ছিল সেখানে। মন্দিরের সামনের নন্দী স্ট্যাচু আঁকড়ে ধরে সে এবং আরও কয়েকজন বেঁচে গিয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো ঢেউটা চলে যাওয়ার পর কী হয়েছিল বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর চোখে জল চলে এল। চারিদিকে দেহ আর চিৎকার। কিন্তু তাঁর যেটা সবচেয়ে বেশি মনে আছে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা একটা হাত আর চিৎকার। তাঁর কথায়, 'আমি তাকে বাঁচাতে পারতাম না কোনোভাবেই। কেবল পরম করুণাময়ের কাছে এই প্রার্থনা করতে পেরেছিলাম, লোকটা যেন দ্রুত মারা যায়'।

ভীমবালিতে থাকা-খাওয়া ফ্রি, সরকারি উদ্যোগে। নিরামিশ রান্না। সে রাত্রে তাঁবুতে শুয়ে মনে হল, আমি রেডক্রশের তাঁবুতে শুয়ে আছি। খুব সম্ভবত রেড ক্রশ এই তাঁবুটি দিয়েছিল, ওই বিপর্যয়ের সময়ে। এই 'সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা'র তীর্থযাত্রায় তা কী করছে? আমি রাতের আশ্রয় পেয়েছি, তাই নিন্দা করতে চাই না, কিন্তু সরকার তার মুখোজ্জ্বল করার জন্য কত নিচে নামবে?

পরদিন সকাল ৬টার মধ্যে উঠে পড়লাম সকলে। ঠিক করলাম তিন কিলোমিটার দূরে লিনচৌলি-তে প্রাতরাশ করব ঠিক করলাম। কয়েকশো কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছালাম রামবরা, যে শহরটা একসময় কয়েক হাজার লোককে ধারণ করত। যেদিন বিপর্যয় হয়েছিল, সেদিন হাজার তিনেক লোক এখানে ছিল বলে অনুমান। এখন এখানে কোনো কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। সমস্ত শহরটি উৎপাটিত হয়েছে এবং নিচের নদীতে পড়ে গেছে। ১৬ জুন রাত্রির বিপর্যয়ে এর পতন শুরু হয়। পরদিনের সকালের বিপর্যয়ে শেষ হয়। যারা বেঁচে গিয়েছিল, তারা ওপরে উঠে গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের বেশিরভাগই মারা গেছে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ঠান্ডায়, ভূমিধসে ... কেউ তার হিসেব রাখেনি। বেশিরভাগ তীর্থযাত্রীই গরিব। তাদের কাছে সেরকম কোনো শীতবস্ত্র নিশ্চয়ই ছিল না। পুরোনো ট্রেকিং রুটের দুদিকই ভেঙে গিয়েছিল। ফলে যারা ওপরের জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য গিয়েছিল, তাদের ওপরে ওঠার বা নিচে নামার কোনো পথ ছিল না। রামবরা থেকে নতুন রাস্তাটি সম্পূর্ণ আলাদা, আমরা মন্দাকিনী নদী পেরিয়ে এপারে চলে এলাম, একটা কোনোমতে দাঁড় করানো সেতু পেরিয়ে। নতুন রাস্তায় বেশ কয়েকটা খাড়া চড়াই রয়েছে। লিনচৌলিতে পৌঁছলাম সকাল দশটায়। ওখানেও আশ্রয় নেওয়ার জন্য রেডক্রশের তাঁবু। পুলিশ এবং শান্তি কুঞ্জ ফাউন্ডেশন যাত্রীদের খাওয়াচ্ছে। প্রশাসন সম্ভবত শান্তি কুঞ্জ ফাউন্ডেশনকে বলেছে, একটু কমসম করে খাওয়াতে, নাহলে সরকারকে তাদের কৃতিত্বের ভাগ দিতে হয়। নয়া ট্রেকিং রুট ধরে চলতে চলতে আমরা দু-তিন জায়গায় ডিনামাইট ব্লাস্টিংয়ের শব্দ পেলাম, এই নয়া রুট তৈরির কারণে ব্যবহার হচ্ছে। মনে হল, পুরো এলাকাটাই তাতে কোনোদিন উড়ে যেতে পারে। আস্তে আস্তে চূড়াগুলো স্পষ্ট হচ্ছিল, রাস্তায় যেতে যেতে দূরে উপত্যকায় নজরে এল একটি হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ। *ক্রমশ*

চলতে চলতে

কার সঙ্গে কথা বলছিলি!

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ১২ অক্টোবর •

মোবাইলের দৌলতে চলন্ত যানবাহনগুলো যেন একটা নাট্যশালা হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন যাত্রী বিভিন্ন সিটে যেন রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন কোণে বসে নানারকম দৃশ্যের অবতারণা করে চলেছে। অবশ্যই এগুলো বেশিরভাগ শ্রুতি নাটক। তবু প্রত্যেকের একক অভিনয়ে এক-একটা ঘটনা অনুমান করে নেওয়া যায়। যেমন ঢাকুরিয়া-বিবাদিবাগ মিনিবাসে এই সন্ধ্যেবেলা :

পিছনের সিটের ডানদিকের কোণে এক যুবতীর উদ্বিগ্ন মুখ, গম্ভীর গলা, — কানে ধরা কালো মোবাইলে সে বলছে, 'সেজো মামা ট্রেনে উঠেছে, বড়ো মামা আসছে, আমি তো এই বাসে, হ্যাঁ, খারাপ তো বটেই, আমি আর কিছু জানি না, হ্যাঁ ঠিক আছে, ... তুমি যা পারো করো, দেখছি দেখছি ...'। এতটা দেখে শুনে আমার মতো দর্শক – শ্রোতা অনুমান করে নিতেই পারে যে ওই মেয়েটার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা অন্য কোনো বিপদ হয়েছে।

ওদিকে বাঁদিকে আমার সামনের সিটে অফিস ফেরত যুবক। ফুলহাতা বুশশার্ট গুঁজে পড়া, কোলে ঢাউস ব্যাগপ্যাক, ডান হাতে ঘড়ি, অনামিকায় পলার আংটি সোনায় বাঁধানো, সাদা ঢাউস মোবাইলে স্ক্রীন ছুঁয়ে ফোন করল, 'কাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটা চেষ্টা করেছি। কার সঙ্গে কথা বলছিলি।' ফোনের ওপাশে একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর আমার সীট থেকে শোনা যাচ্ছে, যদিও কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। যুবক উত্তেজিত, 'এটা কিন্তু লাস্ট ওয়ার্নিং। রাত দশটার পর অন্য কোনো লোক — বন্ধু-ফন্ধু কারো সঙ্গে এনগেজমেন্ট রাখা চলবে না।'

নাট্যমঞ্চের আলো সরে গিয়ে পড়ল ডানদিকে সামনের সিটে। মোটা-সোটা, কায়দার চশমা পরা একজন বয়স্ক লোক। তার ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় সংলাপ শুরু হয়, 'দুর্গাপুরের কেস আলাদা, কলকাতা থেকে ওখানে মাল পাঠাতে হলে নটরাজকে ধরতে হবে। আর, নটরাজকে তোমাদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে নিতে পারলে না। ওর হাতেই সব। ঠিক আছে, ছাড়ো আমি কথা বলে নিচ্ছি।'

পিছনের সিটের উদ্বিগ্ন যুবতী দেশপ্রিয়তে তাড়াহুড়ো করে নেমে গেল। সামনের সিটের যুবকের কথা ভেসে উঠল, 'আমায় ফোন করলি কেন? পারবি, পি.জি. হাসপাতালের সামনে চলে আয়। ক্ষমতা থাকলে হাওড়া স্টেশনে এসে দেখা কর্। পারবি না তো? আরে, আমাকে তো কথা বলতেই হবে। এ ফোনটা তো কাজের ফোন, অফিসের সঙ্গে যে কোনো সময়ে যোগাযোগ করতে হবে। আবার বলছি, আমি কিন্তু রাত দশটার পর অন্য কাউকে অ্যালাও করব না।' অনুমান করা যায় না কি যে, যুবকটি প্রেমিকা বা ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছে? বান্ধবী তাকে ফোনে পায়নি — এরকম পালটা অভিযোগে অফিসের কাজের কারণ দেখাতে হয়েছে — এবং তা সত্ত্বেও পৌরুষের-দাপট প্রেমের অধিকারবোধ যুবকটির কথা শুনে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় কি?

হয় না। সামনের ডানদিকের বয়স্ক মানুষটির ব্যবসা সম্পর্কিত কথাবার্তা থেকেও আন্দাজ করা যায়। বিশেষত যখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় ফোনে 'নটরাজ' নামক ব্যক্তিটিকে ধরে আধো হিন্দি আধো বাংলায় প্রচুর হেঁহেঁ করে তেল লাগানো কথাবার্তা বলতে থাকেন এবং গলার স্বরটা অনেকটা নামিয়ে আনেন ও পাশের যাত্রীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ বিড়বিড় করেন তখন মতলব আঁটার একটা দৃশ্য তো স্পষ্টই ফুটে ওঠে। আমাদের চোখ-কান এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার একটু খোলা রাখলে রোজই তো এমন জীবন্ত নাটক কতই দেখতে পাই চলতে চলতে।

নাগরি মিয়াপুর বাথানিটোলার পর বাথে,

পাটনা হাইকোর্টে দলিত গণহত্যায় দোষীদের খালাসে বিচারব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন

এটি সংবাদমন্থন ওয়েবসাইটে পাওয়া একটি 'অতিথি খবর', প্রতিবেদক নাম উল্লেখ করেননি। সংবাদটি সম্পাদনা করেছেন শমীক সরকার, ৮ নভেম্বর •

গত শতকের শেষ দশকের শেষের কয়টি বছর বিহারে উচ্চবর্ণের সশস্ত্র সংগঠনগুলি (রণবীর সেনা প্রভৃতি) দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর একের পর এক গণহত্যা চালিয়েছিল, সেসময় তা ছিল খবরের শিরোনাম। ফের একবার বাথানিটোলা, লখিমপুর জায়গাগুলি খবরে এসেছে, ফের একরাশ লজ্জা সঙ্গে নিয়ে।

পাটনা হাইকোর্ট সম্প্রতি ১৯৯৭ সালের লখিমপুর গণহত্যার রায় দিয়েছে। যে গণহত্যায় নারী ও শিশু সহ ৫৭ জন দলিত মানুষকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছিল, তার কোনো একজন খুনিকেও শাস্তি দেবার উপযুক্ত বলে উচ্চ আদালত খুঁজে পায়নি। গত ৯ অক্টোবর লখিমপুর বাথে গণহত্যার রায় দিতে গিয়ে পাটনা হাইকোর্ট এমনকী নিম্ন আদালতের রায়কেও সম্পূর্ণ উলটে দিয়েছে। নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন রণবীর সেনার যে ২৬ জনকে উচ্চ আদালতের এই রায়ে বেকসুর খালাস করা হয়েছে, নিম্ন আদালত তাদের মধ্যে ১৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১০ জনকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দেবার মতো মারাত্মক অপরাধের প্রমাণ পেয়েছিল। স্তম্ভিত হওয়ার মতো এই রায়।

গত দেড় বছরের মধ্যে বিহার হাইকোর্ট লখিমপুর বাথে এবং বাথানিটোলা সহ তাদের দেওয়া চারটি রায়ে দলিত হত্যায় অভিযুক্ত এবং নিম্নতর আদালতে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো চরম সাজা প্রাপ্তদেরও বেকসুর খালাস করে দিয়েছে। বাথে গণহত্যার রায়ের আগে বাথানিটোলা, নাগরি এবং মিয়াপুরের দলিত গণহত্যা সংক্রান্ত তিনটি মামলার রায়ে এরকম অদ্ভুত প্রহসন লক্ষ্য করা গেছে।

১৯৯৬ সালে সংঘঠিত বাথানিটোলা গণহত্যার রায় দিতে গিয়ে ১৭ এপ্রিল ২০১২ পাটনা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতে সাজা পাওয়া রণবীর সেনার ২৩ জন অপরাধীকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাথানিটোলার ঘটনায় ২১ জন দলিতকে হত্যার দায়ে নিম্ন আদালত এই ২৩ জনের মধ্যে ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ২০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল।

২০১৩ সালের ১ মার্চ পাটনা হাইকোর্ট ১৯৯৮-এর নাগরি গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ১১ জনকেই বেকসুর খালাস করে দিয়েছে। নাগরি গণহত্যার ঘটনায় রণবীর সেনা ১০ জনকে গুলি করে হত্যা করেছিল, এদের মধ্যে ৩ জনকে নিম্ন আদালত মৃত্যুদণ্ড ও ৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। ২০১৩ সালের ৩ জুলাই মিয়াপুর গণহত্যার রায় দিতে গিয়ে পাটনা হাইকোর্ট নিম্নতর আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তিপ্রাপ্ত ১০ জনের ৯ জনকেই বেকসুর খালাস করে দিয়েছিল। ২০০০ সালে সংগঠিত এই গণহত্যায় ৩২ জন দলিতকে খুন করে রণবীর সেনার লোকজন।

১৯৯৭-এর শেষ রাতে গোটা দেশ যখন নতুন বছর পালনের প্রস্তুতিতে মাতোয়ারা, রণবীর সেনা জাহানাবাদ জেলার লখিমপুর বাথে গ্রামে প্রায় ষাট জনকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। শোন নদীর দু-ধারের দুই এলাকা, বাথানি এবং বাথে জাতীয় খবর হয়ে ওঠে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন বাথানিটোলার ঘটনাকে 'জাতীয় লজ্জা' বলে বর্ণনা করেন। গোটা দেশ জোড়া গণতান্ত্রিক কন্ঠস্বরের চাপে বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ বাধ্য হন রণবীর সেনার পেছনে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক মদতের অনুসন্ধানের জন্য আমীর দাস কমিশন তৈরি করতে। কিন্তু প্রথম থেকেই এই কমিশনকে পঙ্গু করে দেবার চেষ্টা চলে। কমিশন অভিযোগ করে তার কাছে যথেষ্ট অর্থ, কর্মী বা ক্ষমতা নেই।

এর মধ্যে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন সহ বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ধারাবাহিক ও বহুমাত্রিক উদ্যোগ চলছিল উচ্চবর্ণের এই সশস্ত্র সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে। ২০০২ সালে অনেকটাই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া রণবীর সেনা-র প্রধান ব্রহ্মেশ্বর সিং বিহার সরকারের কাছে 'আত্মসমর্পণ' করে। ২০০৫ সালে বিহারে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় এবং বিজেপির সমর্থন নিয়ে জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) নেতা নীতিশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হন। সরকারের প্রথম সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম ছিল আমীর দাস কমিশনকে বাতিল করা। জেডিইউ, বিজেপি নেতাদের অনেকেই, এমনকী আরজেডি বা কংগ্রেসের অনেক নেতাও এতে গভীর স্বস্তি পায়, কারণ তদন্তের জন্য এই কমিশন তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এই জেডিইউ-বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় দফার সূচনাতেই জামিন পেয়ে যান ব্রহ্মেশ্বর সিং। কিন্তু জেল থেকে বেরোনোর পরই খুন হয়ে যান। তারপর ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত চলছে দলিত গণহত্যায় অভিযুক্ত, নিম্ন আদালতে প্রায় সর্বোচ্চ সাজাপ্রাপ্তদের উচ্চ আদালতে একের পর এক বেকসুর খালাস।

নব্বই দশক জুড়ে বিহারে বাথানিটোলা, বাথে সহ একের পর এক দলিত গণহত্যা যেমন লালু জমানার সমাজ-রাজনৈতিক চরিত্রকে উন্মোচিত করে দিয়েছিল, তেমনি এপ্রিল ২০১২ থেকে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আসা হাইকোর্টের চারটি রায় — নীতিশ কুমারের বিহারের সমাজ রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রকট আয়না হয়ে উঠেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচারের স্বার্থে হাইকোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্টের পুনর্বিচার করা দরকার।

কানখুলি ঘোষপাড়ার নাট্যব্যক্তিত্ব অ-কু-দা

শাকিল মহিনউদ্দিন, হাজিরতন, মেটিয়াবুরুজ, ৩১ অক্টোবর •

সেই ষাটের দশকের উত্তাল খাদ্য আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের শরিক হয়ে তাঁর পথে নামা। যুবক অজিত দাস কখনও নেতাদের নিজের লেখা পড়ে শোনান, কখনও আবৃত্তি করেন মঞ্চে মঞ্চে — 'ট্যাক্সি চড়ে ম্যাক্সি পরে আসছে আধুনিকা/ভবিষ্যতে এরাই হবে বারবণিতা ...।

আজ প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় এসেও লেখা, অভিনয়, নাটকের তালিম দেওয়া চালিয়ে যাচ্ছেন অজিত দাস, ওরফে অ-কু-দা। হাওড়া জেলার জগন্নাথপুরে এক সাধারণ গ্রাম্য পরিবারে তাঁর জন্ম। পরবর্তীকালে কানখুলি ঘোষপাড়ার বাসিন্দা। ১৯৮১ সালে আমার ছোটোবেলায় আমি দেখেছি তাঁকে, হাজিরতন বড়ো রাস্তার মোড়ে বড়তলা কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক মঞ্চে তখনকার নাট্যপ্রেমিক লতিফ গাজী, প্রয়াত নজরুল ইসলাম, সেখ খালেক এবং আরও দলবল নিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন 'সবুজ সংকেত' নাটক। মনে আছে, বেশ সাড়া পড়েছিল। এরপর কানখুলি পূর্বপাড়া হরিসভায় সমীর ব্যানার্জি, ধীমান ব্যানার্জিদের নিয়ে মঞ্চস্থ হয়েছিল 'পেরেস্ত্রৈকা'. এরকম আরও অনেক নাটক লিখেছিলেন অ-কু-দা। নাটকে তাঁর রাজনৈতিক পূর্বাভাস অনেক সময় বাস্তব জীবনে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। তবে তিনি ছিলেন চলতি রাজনীতির সমালোচক।

এবছর তাঁর নিবেদন 'মহারানি'। এই নাটকের সংলাপ — 'ধম্মপথে কম্ম বাড়ান, মানুষমারা রাজনীতি দেশ থেকে দূর হটান' — যেন দর্শককে ধাক্কা মেরে সজাগ করে তোলে। অজিতবাবু বড়তলা মোসলেম লাইব্রেরির আড্ডায় প্রয়াত শিক্ষক আখতার হোসেনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। আখতার স্যারের চিন্তাভাবনাও অজিতবাবুর নাটকে উঠে এসেছে — 'রাজার ভাণ্ডার পূর্ণ করে প্রজারা, অর্ধভুক্ত প্রজাদের ভাণ্ডার শূন্য। সূর্য প্রভু, গ্রহগুলি দাস। এভাবেই কেন্দ্র প্রভু, রাজ্যগুলি দাস। পতি প্রভু, পত্নী দাস ... প্রভুত্ববাদ নিপাত যাক।' নাটকের মহারানি তাই চায়।

অ-কু-দার কর্ম জারি রয়েছে 'নাগরিক' নাট্যদলে। এই নাট্যদলের কর্মশালায় প্রস্তুত ছোটোদের রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশিত হল দুর্গাষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় কানখুলি পূর্বপাড়া যুবক সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

মানবাধিকার কমিশনে পুলিশ কর্তা চাই না!

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর •

১৫ নভেম্বর ভারত সভা হলে ২টো থেকে একটা যৌথ কনভেনশন হয় সিপিটিআরএস, কমিটি ফর রিলিজ অব পলিটিক্যাল প্রিজনার্স, বন্দীমুক্তি কমিটি, এসিআরএ এবং মানবাধিকার সংহতির ডাকে। রাজ্য সরকার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের ডিজি নপরাজিত মুখোপাধ্যায়কে নিয়োগের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই কনভেনশন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়।

১৯৭৭-৮০ সালে জাতীয় পুলিশ কমিশন মন্তব্য করেছিল, পুলিশ দিয়ে পুলিশের তদন্ত যথাযথ হয় না। কারণ এক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কাজ করে। কাজ করে মানবাধিকার সম্পর্কে অবজ্ঞা ও অবমাননাকর ধারণা। কনভেনশন থেকে প্রস্তাব নেওয়া হয়, এক, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে মানবাধিকার কমিশনে পুলিশ ও আমলা নিয়োগ বন্ধ করতে হবে; দুই, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে ডিজি নপরাজিত মুখোপাধ্যায়ের নিয়োগ বাতিল করতে হবে; তিন, কমিশনের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

অধ্যাপক মানস জোয়ারদার বলেন পুলিশ-ই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। সেই পুলিশ কর্তাকে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কর্তা বানানো হচ্ছে। এ যেন ভক্ষককে রক্ষক বানানোর অশুভ প্রয়াস।

প্রভাবশালী নেতার মদের কারবারের বিরোধিতা করতে গিয়ে খুন জঙ্গীপুরে

কাদের চৌধুরি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ নভেম্বর •

এলাকার প্রভাবশালী বিত্তশালী ক্ষমতাশালী, বাসুদেবপুরের দু-দুটো দেশি ও বিদেশি মদের দোকানের মালিক, আগে ফরওয়ার্ড ব্লক অধুনা তৃণমূল নেতা জগন্নাথ চৌধুরি যখন বছর দুয়েক আগে জঙ্গীপুরে এলাকা ঘিরলেন বছর দুই আগে, লোকে বুঝে গেল, একটা মদ ফ্যাক্টরি হতে চলেছে। জগন্নাথ যতই বলুন জলের বটলিং প্ল্যান্ট করা হবে, এলাকার মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা তা বিশ্বাস করল না। তারপর আরটিআই করে জানা গেল, মদের ফ্যাক্টরির লাইসেন্স যারা দেয়, সেই এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লেটার অব ইন্টেন্ট পর্যন্ত জোগাড় হয়ে গেছে। কিন্তু বটলিং প্ল্যান্টের জন্য কোনো লাইসেন্স জোগাড় হয়নি। লোকের বুঝতে আর সমস্যা রইল না। এলাকার বুদ্ধিজীবী মানুষরা তৈরি করল 'নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চ' — হিন্দু মুসলিম সবাইকে নিয়ে। সভাপতি ও সম্পাদক হলেন গাজিনগর হাইমাদ্রাসার শিক্ষক নুরুল ইসলাম ফাইজি সাহেব এবং হাইস্কুল শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব সাহেব। ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন তারাপুরের বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলের ফার্মাসির আখতার হোসেন সাহেব। গত বছর রোজার মাসে ডাকবাংলো মোড়ে বিডিও অফিসে গিয়ে হাজার লোক ডেপুটেশন দিয়ে এল, এই মদ ফ্যাক্টরি যেন না হয়। বিডিও বললেন, ওটা কর্তৃপক্ষকে ফরোয়ার্ড করে দেবেন।

এই জগন্নাথ চৌধুরির দেশি ও বিদেশি মদের খুচরো দোকান থেকে হোলসেল মদ বিক্রিও হত, জঙ্গীপুরের বিভিন্ন গ্রামে ঠেক বসত এই সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে। স্কুলে যাওয়া ছেলে মেয়েদের কাছে ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল এইসব ঠেক। ফলে গ্রামবাসীরাও খাপ্পা হয়ে যায় এই মদ সরবরাহের কাজকারবারের প্রতি। গ্রামবাসীরা সরবরাহকারীদের হাতেনাতে ধরে এবং এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দেয়। আপাত দৃষ্টিতে এক্সাইজ বিভাগ গা এড়িয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের গোপন রিপোর্টে জেলাশাসক ও এক্সাইজ কমিশনারের কাছে এই মদের কারবার ও মদের রিটেল দোকান দুটি বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ জানায়। তৎকালীন থানার ওসি-ও এই মদের দোকানগুলির জন্য এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে রিপোর্ট দেন। কিন্তু বর্তমান শাসকদলের একটি লবির নেতা হওয়ার কারণে তাঁর কিছুই হয়নি। জগন্নাথের ছেলে সুনীলও জেলার যুব তৃণমূল নেতা। তাই এমনকী পার্টিও এঁদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়নি।

জগন্নাথের ক্ষমতা এবং তার অপরাধের পূর্বনমুনা থাকার কারণে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চ এসডিপিও-র কাছে সুরক্ষা চেয়েছিল এইবছর রোজা কেটে যাওয়ার পর। এরপর ওই মদের ফ্যাক্টরি বন্ধ এবং এলাকার মদের কারবার বন্ধের দাবিতে ১৫ নভেম্বর একটি ধরনার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়েছিল মঞ্চ। কিন্তু এসপি অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। তখন ঠিক হয়, বিনা অনুমতিতেই ধরনা হবে, যেহেতু ধরনার জোগাড়যন্তর করা হয়ে গিয়েছে। ১০ তারিখে সুনীল চৌধুরি জগন্নাথ চৌধুরিপন্থী তৃণমুল নেতারা প্রকাশ্য সভা করে জানায়, যেভাবে হোক তারা ১৫ নভেম্বরের ধরনা রুখবেই। ওই ১০ নভেম্বর তারিখেই রাত পৌনে এগারোটায় পুলিশ আখতার হোসেনের বাড়িতে ফোন করে জানায়, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চার লেনের যে লেনটি বন্ধ, সেখানে আখতারের দেহ পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে অ্যাকসিডেন্ট। আখতার সাহেব তখন তাঁর ফার্মেসি থেকে ফিরছিলেন। তারাপুর হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত্যু হয়। পরদিন ভোরবেলা মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শয়ে শয়ে লোক জড়ো হয়ে যায় হাসপাতালের সামনে। পুলিশ মৃতদেহ সরিয়ে নিতে চাইলে জনতা বাধা দেয়। পুলিশ অভিযোগ করে, তাদের আক্রমণ করা হয়েছে এবং সাইফুদ্দিন, আবদুল ওয়াহাব, রফিকুল ইসলাম সহ ৬ জনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। জনতা মৃতদেহ নিয়ে 'দুর্ঘটনা' স্থলে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। আখতারের পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশে এফআইআর করা হয়, এটা দুর্ঘটনা নয়, খুন। তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই ও দোষীদের শাস্তি চাই। পুলিশ বহরমপুরে পোস্ট মর্টেম করাতে নিয়ে যায় দেহ।

তারপরই শুরু হয় আর এক অধ্যায়। ওইদিন ১১ নভেম্বর সন্ধ্যেবেলা বাসুদেবপুর ঘিরে ফেলে র‍্যাফ এবং জঙ্গিপুরে সাইফুদ্দিনের পরিবারের লোকজনকে মারধোর করা হয়। ১২ নভেম্বর মালদার কংগ্রেস সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবু হাসেন চৌধুরি তাঁর দলবল নিয়ে আসেন মৃতের বাড়িতে। দেখা যায়, তাদের পাশেপাশে ওই বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে জগন্নাথ চৌধুরির ডান হাত মুজিবুর রহমান ও টুণ্ডা। লোকে তাদের ওপর চড়াও হয়। তারা চৌধুরি সাহেবের গাড়িতে গিয়ে লুকোয়। কিন্তু চৌধুরির বডিগার্ডরা তাদের গাড়ি থেকে বের করে আনে। তাদের কোমরে পাওয়া যায় আঠারো ইঞ্চির চাকু। র‍্যাফ তাদের গ্রেফতার করে।

এলাকার ছোটো ছোটো পার্টি ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়া, এসডিপিআই প্রশাসনের সাথে দেখা করে এবং হত্যার তদন্ত, দোষীদের শাস্তি, এলাকায় পুলিশি অত্যাচার বন্ধ, এবং গ্রেপ্তার হয়ে আছে যারা তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে আসে। কিন্তু ১৪ তারিখ একটি মৌন মিছিল করতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। তর্কাতর্কির পর একটি ছোটো এলাকায় মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়, সেখানেই সহস্রাধিক মহিলা মিছিলে অংশ নেয়। আজ ১৫ নভেম্বর সামশেরগঞ্জ, সূতি ও ফারাক্কা ব্লকে এসডিপিআই বন্ধ ডেকেছিল।

সদ্য কিশোরী চাম্পা-র 'বিয়ে' আটকানো গেল না

ফজর আলি, রামচন্দ্রখালি, ১৩ নভেম্বর •

রামচন্দ্রখালি নরেন্দ্র শিক্ষানিকেতনের ক্লাস সিক্সের ছাত্রী গরিব পরিবারের মেয়ে চাম্পা মোল্লার বিয়ে হয়ে গেল গত বৃহস্পতিবার। পাত্র বাসন্তী থানারই আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তালদা গ্রামের ১২-১৩ বছর বয়সী কিশোর।

কয়েকদিন ধরে যখন ছাত্রীটি স্কুলে আসছিল না, তখন তার সিনিয়র, ক্লাস এইটের কিছু ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের জানায়, চাম্পা-র বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খুব খারাপ এটা। তাকে যেন স্কুলে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে স্কুল থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়। তা আজ দিন পনেরো কুড়ি আগের কথা। তারা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে। প্রধান শিক্ষক প্রথমে ব্যবস্থা নিতে রাজি হলেও, স্কুলের কিছু শিক্ষক বলে, এই ব্যাপারে নাক গলালেই ঝামেলা। তাই শুনে নাকি প্রধান শিক্ষক সরে আসেন। তারপর ছাত্রছাত্রীরা বিডিও-র সঙ্গে গিয়ে দেখা করে।

বিডিও সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে বলে ব্যবস্থা নিতে। প্রধান চাম্পার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু বোঝাতে ব্যর্থ হয়। এরই মধ্যে চাম্পার বাড়ির লোক জানতে পারে, স্কুল ছাত্র প্রতিবেশি মোজাফফর পুরকাইত এই বিয়ে যাতে না হয় সে ব্যাপারে ইন্ধন দিচ্ছে। আরও আছে একজন, রামচন্দ্রখালির ছাত্রী সাহিনা। এরাই নাকি বিডিওকে বলেছে সব। চাম্পার বাড়ির লোকজন মোজাফফরের বাড়ির ওপর চড়াও হয়। দল বেঁধে এসে তার বাবা-মা কে মারধোরও করার হুমকি দেয়। এ ছাড়াও বলে, গরিবের মেয়ের বিয়ে ভাঙার জন্য মোজাফফরকে রাস্তায় পেলে তারা মেরেই ফেলবে। মোজাফফর বাধ্য হয় এলাকা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে।

একসপ্তাহ পর বিয়ের দিন স্কুলের দাদা-দিদিরা ফের বিডিও-র সঙ্গে দেখা করে। বিডিও তখন নিজে গ্রামে চলে যান এবং গায়ে হলুদের মধ্যেই বিয়ে বন্ধ করে দিয়ে আসে। শুরু হয় মোজাফফারের বাবা-মার ওপর অত্যাচার। বিডিও তখন মোজাফফারের বাবা-মাকে বলেন, অফিসে এসে দেখা করতে। কিন্তু বাবা-মা সেখানে গিয়ে অফিসারের দেখা পায়নি।

ওদিকে রাতারাতি রাজনৈতিক নেতাদের ধরাধরি করে চাম্পার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

এরকম মন্তব্য শিক্ষকরা কী করে করেন?

৬ নভেম্বর, ফারহা খান, আকড়া, মহেশতলা •

আমি তখন ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি। আমাদের সাত-আটটা করে পিরিয়ড থাকত। মনে আছে, প্রথম পিরিয়ডে জিয়োগ্রাফির ক্লাস ছিল। ম্যাডাম এসে যখন ক্লাস নিচ্ছিলেন, পপুলেশন বলে একটা চ্যাপ্টার ছিল। ক্লাসের মধ্যে পড়াতে পড়াতে উনি বলেন, বেশিরভাগ জনসংখ্যা হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের। একটা লোকের তিনটে করে বিয়ে আর দুটো করে বাচ্চা হয়, মোট ছ-টা বাচ্চা হয় মুসলমানদের। শুনে আমার খুবই খারাপ লাগল। ক্লাস ওভার হয়ে যাওয়ার পর মুডটা খারাপ হয়ে গেল। পিছনের বেঞ্চে বসেছিল আমার খুব ভালো বন্ধু সঞ্চারী, ও হয়তো ম্যাডামের কথার মানেটা বোঝেওনি, হুট করে জিজ্ঞেস করে আমায়, 'তুই তোর বাবার কত নম্বর সন্তান?' আমি শুনে কী বলব? দ্বিতীয় ক্লাস তখনও শুরু হয়নি। আমি বাথরুমে ছুটে গিয়ে খুব কেঁদে নিলাম। কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, আমার বাবাকে অপমান করা হয়েছে, ধর্মের ব্যাপারটা অত বুঝিনি। তাই আমি কিছুতেই তা মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। টিফিন অবধি এর জের চলল। আমি ক্লাসের পড়াতেও মন বসাতে পারছিলাম না। হঠাৎ কী যে হল, ক্লাসে এসে সবার সামনে আমি সঞ্চারীকে ঘুরিয়ে একটা চড় মারলাম। মেরে চিৎকার করে বললাম, 'আমি আমার বাবার একমাত্র স্ত্রীয়ের একটাই মেয়ে।' জিওগ্রাফি ম্যাডাম জানতেন না এসব হয়েছে। সঞ্চারী গিয়ে আমার নামে প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করল। আমার তখন জেদ চেপে গেছে। আমি ভাবলাম, আমি কোনো ভুল করিনি, আমার কোনো ক্ষতি হতে পারে না। প্রিন্সিপাল এসে আমাকে ডাকলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি ওকে চড় মেরেছি? আমি জিওগ্রাফি ক্লাসের ঘটনাটা প্রিন্সিপালকে খুলে বললাম। জিওগ্রাফি ম্যাডামকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ক্লাসে ম্যাডাম মুসলমান জনসংখ্যা নিয়ে ওরকম মন্তব্য করেছেন কিনা। ম্যাডাম তা অস্বীকার করলেন। আমাকে বলা হল, তুমি সঞ্চারীর কাছে ক্ষমা চাও। আমি কিন্তু সেইসময় ক্ষমা চাইনি। আমাকে জানানো হল, গার্জেন কল করা হবে। কিন্তু সেসব করা হয়নি। মনে হয়, ওঁদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়েছিল। তারপরে ওই ম্যাডাম আমার কাছে এসে বলেছিলেন, তাঁর ভুল হয়েছিল।

বিদ্যাভারতীতে পড়াকালীন আমি প্রচুর ঝামেলা ফেস করেছি। যেমন, সাজগোজ নিয়ে। একবছর তিনখানা ঈদ ছিল। সাধারণত ঈদ হয় দুবার, ঈদলফেতর আর ঈদজ্জোহা। সেবার দুটো ঈদলফেতর আর একটা ঈদুজ্জোহার তিনদিন ছুটি হওয়ার ফলে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'তোদের এত পরব কেন?' যেহেতু তখন আমি ক্লাসে একাই ছিলাম, আমি অসহায় বোধ করলাম। এখন অনেক মুসলিম মেয়ে ভরতি হয়েছে। আমি ইংলিশের ম্যাডামকে গিয়ে নালিশ করলাম। তিনি বললেন, 'তোদের না হয় তিনদিন, আমাদের তো বারোমাসে তেরো পার্বণ।' এখনও কাজ করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু ফেস করি। কিন্তু তার প্রত্যুত্তর আমি দিতে পারি। তখন ছোটো ছিলাম, তাই সঞ্চারীকে মেরেছিলাম। আমার এখন সেটা ভাবলে খারাপ লাগে। সত্যিই আমার কথার মাধ্যমেই ওকে বোঝানো উচিত ছিল। পরে ও অবশ্য আমার কাছে এসে দুঃখপ্রকাশ করেছিল। ঘটনাচক্রে কলেজে আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়তে গিয়েছিলাম। সঞ্চারী হয়তো পরে আরও ব্রডলি বিষয়গুলোকে দেখতে শিখেছে। কিন্তু এখনও এসব ভাবনা মানুষের মধ্যে রয়েছে। ট্রেনে যাতায়াত করতে গিয়েও নানা আলোচনা শুনতে পাই। আমার মনে হয় সেরকম অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করা উচিত। আমার একটা ছোটো বোন রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ছে। ওখানকার টিচার পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, শাহরুখ খান থেকে শুরু করে সব মুসলমানরা টেররিস্টদের সঙ্গে যুক্ত। এসব মন্তব্য শিক্ষক হয়ে করেন কী করে?

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

পাথরা, অজানা অচেনা মন্দিরময় গ্রাম

দীপঙ্কর সরকার, হালতু, ৫ নভেম্বর •

পাথরা একটি অদেখা অচেনা গ্রাম কংসাবতী নদীর তীরে, পশ্চিম মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর শহর থেকে ১০ কিমি দূরে। খড়্গপুর স্টেশন থেকে বাসে করে ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে নেমে বাঁদিকে গ্রামীণ রাস্তা ধরতে হয় অটোয় চড়ে। পাথরা গ্রামে মোট ৩৪টি মন্দির আছে। সেগুলির প্রতিটি প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো। এর মধ্যে ২৮টি মন্দির পরিচালিত ও সংরক্ষিত হয় আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া দ্বারা। একটি বেসরকারি সংস্থা পাথরা আর্কিওলজিক্যাল প্রিসারভেশন কমিটি মন্দিরগুলি দেখাশুনা করে থাকে (৯৯৩২৭৮৫১২৬)।

১৭৭২ সালে নবাব আলিবর্দী খাঁ, বিদ্যানন্দ ঘোষালকে রত্নাচক পরগনার রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে নিয়োগ করেন। বিদ্যানন্দ তখন গ্রামে একের পর এক ৩৪টি মন্দির স্থাপন করেন হিন্দু পুণ্যার্থীদের জন্য। এতে নবাব বিদ্যানন্দের কাজকর্মে খুশি হননি, যার জন্য বিদ্যানন্দকে জেলে পাঠান, ফাঁসিতে চড়ান বলে কথিত আছে।

কংসাবতী নদীর পশ্চিম পারে নবরত্ন মন্দির মুল আকর্ষণ। ২৫০ বছরের পুরোনো ৪০ ফুট উঁচু মন্দিরের ৯টি চূড়া। অসংখ্য টেরাকোটা প্যানেল আছে দেওয়ালে। একটি ছোটো আটচালা মন্দির স্থাপিত হয় ১৮১৬ সালে, একই জায়গায়। এরই উল্টোদিকে তিনটি আটচালা মন্দির আছে। একটি ছোটো নবরত্ন মন্দির, শিবালয় আছে। এগুলি সব টেরাকোটা শিল্প কাজ দ্বারা শোভিত ও চিত্রিত। এদের পিছনে একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গাদালান আছে।

কিছুদূর এগিয়ে খোলা আকাশের নিচে, উঁচুনিচু অসমান রাস্তার পাশে পঞ্চরত্ন মন্দির অবস্থিত। টেরাকোটা শোভিত। টেরাকোটা প্যানেল যেগুলি আজও বর্তমান, সেগুলি রাম বলরাম, রাধাকৃষ্ণ, দশাবতার হনুমান, দুর্গার প্রতিকৃতি বহন করছে। বেশিরভাগ মন্দির কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও শিবের নামে উৎসর্গীকৃত।

দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির হল শীতলা মন্দির। এটি ৪০ ফুট উঁচু। অন্যান্য মন্দিরগুলো হল সর্বমঙ্গলা, কালাচাঁদ, দশমহাবিদ্যা।

পাথরার মন্দিরের ছবি প্রতিবেদকের তোলা

একটি সাধারণ মন্দিরের রাসমঞ্চ স্থাপিত হয় ১৮৩২ সালে। এটির ছোটো নয়টি চূড়া আছে। স্থানীয় বাসিন্দা ইয়াসিন পাঠান ও তার সহযোগী শিক্ষাব্রতীদের একান্ত চেষ্টায় এই পাথরা গ্রামকে একটি ঐতিহ্য পর্যটন কেন্দ্র করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদের চেষ্টায় বাংলায় হারিয়ে যেতে বসা মন্দির স্থাপত্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

বাসরাস্তা থেকে গ্রামে পৌঁছাতে মিনিট ২০ লাগে অটোতে, ভাঙাচোরা আঁকাবাঁকা সে রাস্তা বর্ষায় চলার অযোগ্য। অচল রাস্তার দুদিক কংসাবতীর খোলাপ্রান্তরে গিয়ে মিশেছে, দুপাশে খোলা আকাশের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আজও অসংখ্য মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নদীর নৈসর্গিক দৃশ্যের সাথে সাথে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের দক্ষতার ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ইতিহাস, মানুষ প্রকৃতি ও তার শিল্পীসত্ত্বা, আর আজকের নগরায়নের অভিজ্ঞতা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। ইতিহাস বোধ থেকে না শিল্পীর হাতের কাজ কোনটা যে মনকে আন্দোলিত করে তা বুঝে উঠতে উঠতেই বাড়ি ফেরার সময় হয়ে যায়।

‘তুমি পড়ো, তুমি ভুলে যাও; তুমি দেখো, তুমি মনে রাখো; তুমি করো, তুমি বোঝো।’

১৩ নভেম্বর, জিতেন নন্দী •

কলকাতা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরত্বে শ্রীরামপুর। সেখান থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে পেয়ারাপুর অঞ্চলের বড়বেলু গ্রামে গড়ে উঠেছে শ্রমজীবী হাসপাতালের দ্বিতীয় ইউনিট। ২০১২ সালের আগস্ট মাস থেকে এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ শুরু হয়েছে। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ইন্দোজাপান স্টীল্‌স লিমিটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও পিপল্‌স হেল্‌থ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় শুরু হয়েছিল ‘শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প সমিতি’র কাজ। গড়ে উঠেছিল বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল। আজ সেই প্রকল্প শ্রীরামপুরে প্রসারিত হয়েছে।

আজ আমরা গিয়েছিলাম বড়বেলু গ্রামের এই নতুন হাসপাতালটিতে। যখন বেলুড়ের কাজ শুরু হয়েছিল, তখন সেখানে জড়ো হয়েছিলেন বেশ কিছু হৃদয়বান চিকিৎসক, যাঁরা চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিছক একটি ব্যবসা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। আজ বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম করে এক অতি লাভজনক এবং নৃশংস অমানবিক বাণিজ্য ডানা মেলেছে চতুর্দিকে। মিডিয়া বলছে এটাই এ যুগের দস্তুর! সত্তর-আশির দশকের জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই স্বাস্থ্য-বাণিজ্যের নির্মমতার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছিল। তারই প্রতিফলন ঘটেছিল ‘শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প’-এর মতো প্রকল্পগুলোতে। আজ সেই আন্দোলন নেই। কিন্তু বেলুড়-শ্রীরামপুরের মতো উদ্যোগগুলো রয়েছে। এখানকার কর্মীরা ভেবেছেন, এই পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের কাজকে এগিয়ে নিতে হলে দরকার নতুন চিকিৎসক, দক্ষ সেবক-সেবিকা এবং স্বাস্থ্যকর্মী। তাই বড়বেলু গ্রামের এই প্রকল্পে হাসপাতালের পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছে শ্রমজীবী বিদ্যালয়। সেখানে বেশ কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুরু হয়েছে শিক্ষাদান কর্মসূচি। নানান প্রান্ত থেকে আসছেন বহু অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁরা এই শিক্ষাদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যোগদান করেছেন।

আজ প্রবীণ শিক্ষাকর্মী সমর বাগচি এখানে আসেন। সকাল এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত টানা দু-ঘন্টা তিনি ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেন। উপস্থিত ছিলেন এখানকার পড়ানোর কাজে যুক্ত

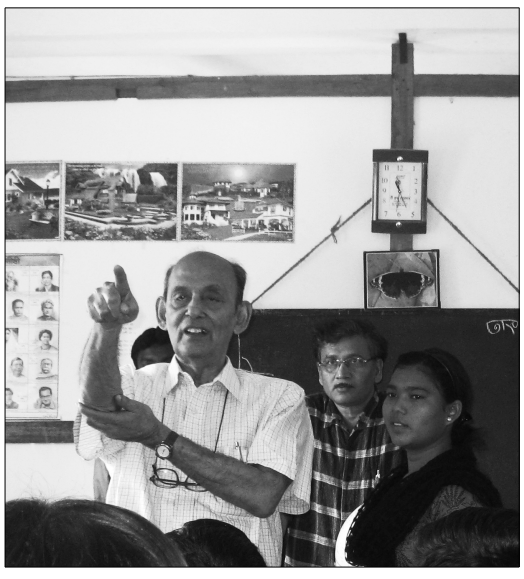

শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমর বাগচি, ছবি প্রতিবেদকের তোলা, ১৩ নভেম্বর

আরও কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

প্রথমে ভূগোল দিয়ে শুরু হয়। নিজেদের শরীরকে ব্যবহার করে সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ ও তারাদের পারস্পরিক অবস্থান ও গতি বোঝানো হয়। এরপর হয় বিজ্ঞানের আলোচনা। পাস্কালের সূত্র, আর্কিমিদিসের নীতিকে হাতেকলমে অত্যন্ত সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝানো হয়। এত লম্বা সময় জুড়ে ছেলেমেয়েদের আগ্রহী অংশগ্রহণ ছিল সত্যিই উৎসাহব্যাঞ্জক। তারাও তাদের শিক্ষককে গান গেয়ে শোনায়, হাতে লেখা পত্রিকা দেখায়। সমর বাগচি বলেন একটা চীনা প্রবাদের কথা : ‘তুমি পড়ো, তুমি ভুলে যাও; তুমি দেখো, তুমি মনে রাখো; তুমি করো, তুমি বোঝো।’ অনুভব করি, সত্যিই হাতে-কলমে শেখার তুলনা নেই।

অভিবাসন নিয়ে চারুচেতনার নাটক ‘বহুব্রীহি’

তমাল ভৌমিক, কলকাতা, ১০ নভেম্বর •

কসবার নিম্নবিত্ত এলাকার শিশু কিশোরদের সংগঠিত করে চারুচেতনা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রায় দুই দশক। চারুচেতনার বার্ষিক উৎসব হল ১০ নভেম্বর ২০১৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন ভবনে। শুরুতে শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণের পরে প্রথমে হল রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা-র বাছাই অংশ। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর নাচ গান অভিনয় বেশ ভালো।

পরের নাটকের নাম ‘বহুব্রীহি’। সুকান্তর ‘হে সূর্য শীতের সূর্য ...’ কবিতাটি দিয়ে শুরু করে, মধ্যে জীবনানন্দর কবিতা ও শেষে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ‘উটপাখি’-র কয়েক লাইন, আর বেশিটাই রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’র কিছু অংশ — এই দিয়ে একটা কোলাজ তৈরি করেছেন নবেন্দু সেনগুপ্ত, নাটক পরিচালনা করেছেন সুশান্ত দাস। নাটকে একটা ধাতব মইকে ব্যবহার করা হয়েছে মঞ্চসজ্জার প্রায় একমাত্র উপকরণ হিসেবে। নাটকের মাঝখানে পর্দায় প্রোজেক্টরের সাহায্যে জলছবির ব্যবহার — – তাতে গঙ্গার তীর, ব্যস্ত কলকাতার নানা টুকরো ছবি ও বস্তিবাসী শিশুদের ছবি আঁকা, খেলাধুলো করার দৃশ্যের পেছনে আবহসঙ্গীতের নানা যন্ত্রে রাগরাগিনীর টুকরো। নাটকটাতে ‘মাইগ্রেশন’ অর্থাৎ কাজের জন্য গ্রামের লোকের শহরে চলে আসা, আবার শহরের বৈভব ও বিত্তর নির্মম ধাক্কায় শহর থেকে ছিটকে গিয়ে মানুষের হারিয়ে যাওয়া — এই বিষয়টাকেই ধরতে চাওয়া হয়েছে।

কেমন হয়েছে নাটকটা — এই প্রসঙ্গে তিনজন দর্শকের প্রতিক্রিয়া বলছি। এক যুবক হলের ভেতরেই নাটক চলাকালীন চেঁচিয়ে বলেছেন, ‘ওরে বোর হয়ে যাচ্ছে’। আমার পাশে বসা এক মহিলা বলেছেন, ‘নাটকটা ট্যান হয়ে গেছে’ — মানে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। নাটকের শেষে একজন প্রৌঢ় প্রৌঢ়াকে জোর গলায় বলেছেন, ‘বেশ বলিষ্ঠ প্রযোজনা বলো’। প্রৌঢ়া মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলছেন।

আমার নিজের কাছে নাটকের মধ্যে রক্তকরবীর অংশটা খুব ভালো লেগেছে। নটীর পূজার যে মেয়েটি নটীর অভিনয় করেছিল, সে এই নাটকে রক্তকরবীর ‘নন্দিনী’র অভিনয় করেছে সাবলীলভাবে। বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, ফাগুলাল, চন্দ্রা ও বিশুপাগলার ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছে। এই নাটকটার শারীরিক অভিনয় এক বড়ো সম্পদ। তবে সবচেয়ে বড়ো পাওনা হল, ‘বস্তির ছেলে-মেয়ে’ বলে যাদেরকে আমরা একটু দূরে সরিয়ে রাখি, তাদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির সম্ভাবনা খুঁজে বার করতে পারার এই উদ্যোগ।

খ ব রে দু নি য়া

ফের সামুদ্রিক ঝড়ের হানা, বিধ্বস্ত পূর্ব ফিলিপাইন্স

কুশল বসু, ১৫ নভেম্বর, সূত্র উইকিপিডিয়া •

টাইফুন হাইয়ানের দাপটে বিপর্যস্ত ফিলিপাইন্স। এই দেশটিতে প্রায় প্রতিবছরই একাধিক সাইক্লোন বা টাইফুন আছড়ে পড়ছে পূর্ব দিক থেকে। ক্ষতিও হচ্ছে অনেক। ইদানীং এইসব টাইফুনের জোর বেড়ে গেছে। ৭ নভেম্বর যেদিন টাইফুন হাইয়ান আছড়ে পড়ল ফিলিপাইন্সে, সেদিনই আন্তর্জাতিক ক্লাইমেট কনফারেন্সে ফিলিপাইন্সের প্রতিনিধি অনশন শুরু করেছেন। সেখানে দেখানো হয়েছে, টাইফুনের ভয়ঙ্করতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের নিবিড় যোগ রয়েছে।

২ নভেম্বর উৎপন্ন হবার পর এই টাইফুনটি শক্তি বাড়িয়ে ৭ নভেম্বর ফিলিপাইন্সের একদম পূর্বদিকের পূর্ব-সামারা এবং লেইতে দ্বীপে আঘাত হানে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই টাইফুনের শক্তি দাঁড়িয়েছিল পৌনে চারশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এর আঘাতে এই দ্বীপগুলির শহরগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। শহরগুলিতে এমন কোনো বাড়ি ছিল না, যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

পূর্ব সামারের গুইয়ান শহরে প্রথম আঘাত হানে টাইফুনটি। এই জেলে-শহরটিতে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ জানা যায়নি ১০ নভেম্বরের আগে। অবশেষে ১০ তারিখে বায়ুসেনার বিমান প্রথম এই শহরে ঢোকে।

আর একটি শহর তাকলোবান সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শহরের পূর্বদিকের নিচু এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্য এলাকায় ক্ষতি হয়েছে ৯০ শতাংশ। শহরটির জেলগুলি ভেঙে পড়েছে, কয়েদিরা বেড়িয়ে পড়েছে। বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে শহরটি খালি করা হচ্ছে। কিন্তু তা করা যাচ্ছে না ভালোভাবে, কারণ বিদ্যুৎ নেই, তাই দিনের বেলা ছাড়া বিমান ছাড়তে পারছে না। একটি বিমান অবতরণ করলেই মানুষ পাগলের মতো আছড়ে পড়ছে বিমানবন্দরের

ছবিতে হাইয়ানের থেকে বেঁচে যাওয়া দুর্দশাগ্রস্ত মা আর ছেলেমেয়ে, চেবু শহর, ফিলিপাইন্সে ৮ নভেম্বর, রয়টার্স

দিকে। মিলিটারি অধ্যুষিত রেখেও তাকলোবান শহরকে স্বাভাবিক করা যাচ্ছে না।

এই শহরেরই প্রতিবেশী একটা শহর আলাঙ্গালানে একটি শস্য-গুদাম লুঠ করেছে মানুষ। লুঠ করতে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে আটজন মারা গেছে।

১৫ নভেম্বর ফিলিপাইন্স সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো মানুষ মারা যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর বেসরকারি সংস্থাগুলির মতে মৃতের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি।

ফুকুশিমার শিশুদের মধ্যে থাইরয়েড ক্যানসার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে

ছবিতে ৪নং চুল্লির জ্বালানি দণ্ড কীভাবে বের করে আনা হবে তার ছবি, টেপকোর ওয়েবসাইটে পাওয়া

২০১১ সালের বিপর্যয়ের পরপরই রেডিয়েশন মাপার যন্ত্রের সামনে শিশুরা।

শমীক সরকার, ১৫ নভেম্বর •

সম্ভবত সোমবার ১৮ নভেম্বর থেকে ফুকুশিমার ভেঙে পড়তে বসা ৪নং চুল্লির জ্বালানি দণ্ডগুলো বাইরে বের করে আনার চূড়ান্ত ঝুঁকির কাজটি শুরু হতে চলেছে। দণ্ড বের করে আনার একটি চূড়ান্ত অভিনয় তৃতীয় পক্ষের সামনে করে দেখানো হয়েছে ১৩-১৪ তারিখ। এরপর সোমবারই শুরু হতে চলেছে চূড়ান্ত কাজ। এমনিতেই কাজটি কঠিন, আরও কঠিন হয়ে গেছে কিছু জ্বালানি দণ্ড সম্পূর্ণ রূপে বেঁকে যাওয়ায়। জ্বালানি দণ্ড যে তরলের মধ্যে থাকে, তাতে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে দেখে প্রকল্পটি পরিচালক টেপকোর এই ধারণাই হয়েছে।

ওদিকে সম্প্রতি ফুকুশিমার বাচ্চাদের মধ্যে ক্যানসারের প্রকোপের গবেষণা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, ফুকুশিমার প্রভাবে বাচ্চাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে থাইরয়েড ক্যানসার বাড়ছে। সরকারের স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ নেওয়া ২,৮৯,৯৬০ জন শিশুর মধ্যে ৫৯ জনের থাইরয়েড ক্যানসারের প্রমাণ মিলেছে, অর্থাৎ প্রতি পাঁচ হাজারে একজন। এই হার স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। ফুকুশিমা বিপর্যয় পূর্ববর্তী সময়ে প্রতি চারলক্ষ শিশু পিছু ১.৫ জনের থাইরয়েড ক্যানসার দেখা যেত।

ওদিকে ফুকুশিমার এক নম্বর চুল্লির নিচের দিকের টোরাস ঘরের ওপরে ছাদে এবং একদিকে ছিদ্র পাওয়া গেছে, টেপকোর রোবোট ক্যামেরায় এরকমই ধরা পড়েছে।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক শমীক সরকার
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata 18. Editor Shamik Sarkar.